প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সিরাতগ্রন্থ

সিরাতে মোগলতাই

আলাউদ্দিন মোগলতাই ইবনু কালিজ
অনুবাদ : জমির মাসরুর

হসন্ত
প্র কা শ ন

অনুবাদকের ভূমিকা

সিরাত ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অবশ্য সিরাত শুধু ইতিহাসের অংশ নয়, বরং তাকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে ইসলামিক আইন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিনার। সিরাত মুসলমানের আইন, মুসলমানের সংস্কৃতি, মুসলমানের ঐতিহ্য। সিরাত হলো রাসুলের চারিত্রিক সুষমা। রাসুলের চরিত্র পুরোটাই কুরআন। সিরাতের এ মাহাত্ম্যের কারণে সেই শুরু যুগ থেকে বিশেষভাবে চর্চিত হয়ে আসছে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। চর্চিত হয়ে আসছে বহু ধারায় ও বহু শাখায়। কেউ সিরাতের একটি পর্ব লিখতে পার করেছেন খণ্ডের পর খণ্ড, কেউ পুরো সিরাতকে করেছেন এক মলাটবদ্ধ। কেউ শুধু বলে গিয়েছেন সিরাতের শুরু থেকে শেষ—তাসবিহ গোনার মতো, আবার কেউ নবিজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন; সাথে সাথে তুলে এনেছেন তাতে লুকিয়ে থাকা অসংখ্যা অগণিত মুক্তো-মানিক। সিরাত বর্ণনার সে বিচিত্র ধারার একটি অংশ আলাউদ্দিন ইবনু কালিজ মোগলতাই রচিত 'আল ইশারাহ ইলাস-সিরাহ'। এতশত সিরাতগ্রন্থের মতো সিরাতু মোগলতাইও স্বমহিমায় ভাস্বর। একেবারে অনুপম, অনন্য। তিনি সিরাতকে জীবনীস্বর্বস্ব বর্ণনায় ক্ষান্ত রাখেননি, সিরাতের শব্দে শব্দে, বাক্যে বাক্যে তিনি ডুব দিয়েছেন, তারপর সেই শব্দ ও বাক্য ছেঁকে বের করে এনেছেন সিরাতের নির্যাস, কাগজের তস্তরিতে সাজিয়ে পেশ করেছেন পাঠকের সম্মুখে। প্রথমেই আমরা বইয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি—

১. এটি সংক্ষিপ্তধারার একটি সিরাতগ্রন্থ। তবে সংক্ষিপ্ততার অর্থ এটা নয়—তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি অংশগুলো বাদ দিয়েছেন। লেখকের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি অনেক বড় ঘটনাকেও কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং বাক্যে সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে চলে এসেছে নবিজীবনের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়।

ভূমিকা

মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাআলার প্রশংসা। দুরুদ ও সালাম রবের মনোনীত রাসুলে মুস্তফার ওপর, তার পরিবার ও সাহাবাগণের ওপর। দুরুদ ও সালাম অবিরত ঝরুক যতদিন দিন-রাতের ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া চলমান। পরকথা, আরব ও আজমের শ্রেষ্ঠপুরুষ, মহান বিচারক, সাইয়িদ জালালুদ্দিন একবার আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন সিরাতু মুস্তফা ও পরবর্তী খলিফাদের নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বই লিখি; যে বইয়ে প্রচুর উপকারী বিষয় সংযুক্তির পাশাপাশি দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হবে। বইটিতে দীর্ঘ আলোচনা বাদ দিয়ে জরুরি বিষয়গুলো এমনভাবে উল্লেখ করা হবে, সংক্ষিপ্ত হলেও যেন তার মাধ্যমে ঢের বিস্তর বইয়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। সাধারণ মুসলমানরা যেন সিরাত জানার আশ্রয় খুঁজে পায়, আলেমদের প্রয়োজনও মিটে যায়। উস্তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে আমি ইসতেখারা করলাম; ইতিবাচক ইশারা পেতেই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। আমার লিখিত 'আজ-জাহরুল বাসিম' বই থেকে সংক্ষেপে আলোচনাগুলো একত্র করলাম। তবে সেখানে উল্লিখিত হাদিস ও ঘটনাগুলো বাদ দিতে পারিনি। কারণ, আর কিছু উল্লেখ না করলেও সেগুলো আমি উল্লেখ করবই। তবে সর্বক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বর্ণনাটির প্রতি আমি লক্ষ রেখেছি।

আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করি, তিনি যেন বইটিকে একনিষ্ঠরূপে কবুল করে নেন, কেয়ামতের ময়দানে সকল ছায়া যখন হারিয়ে যাবে তখন এই কিতাবের ওসিলায় যেন মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

—আলাউদ্দিন মোগলতাই ইবনু কালিজ

সিরাতু মোগলতাই

নবিজির নামসমূহ

মুস্তফা, মাহি, হাশির, আকিব, মুকাফফা, শাহিদ, মুসাদ্দিক, নুর, মুসলিম, আবদ, দায়ি, ইমাম, হাদি, মুহাজির, বাশির, নাজির, সিরাজ, মুনির, আমিন, জিকর, মুজাক্কির, আমিল, মানসুর, উজনু খাইর (কল্যাণস্রোতা), মুজ্জাম্মিল, মুদ্দাসসির, তাহা, ইয়াসিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, রউফ, রহিম, সাহিব, শাফি, মুশাফফা, মুতাওয়াক্কিল, মুবারক, রহমাত, আমির, নাহি (নিষেধকারী), তায়্যিব, কারিম, মুহাল্লিল (হালাল ঘোষক), মুহাররিম (হারাম ঘোষক), ওয়াজি (স্থাপনকারী), রাফি, মুজির, কাসিম, নাবিউত্তাওবা (তাওবার নবি), নাবিউররাহমাহ (রহমতের নবি), নাবিউল মালহামাহ (যুদ্ধের নবি), আবদুল্লাহ, আহমাদ, মুহাম্মাদ।[১]

ইবনু দিহয়া বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম প্রায় একশটি। কোনো কোনো সুফি এই সংখ্যাকে এক হাজার পর্যন্ত বলেছেন।[২]

নবিজির উপনাম ছিল আবুল কাসিম ও আবু ইবরাহিম।

বংশধারা

বাবার নাম আবদুল্লাহ। তাকে জাবিহও (জবাইকৃত) বলা হত। আবদুল্লাহর জন্মের পূর্বে তার বাবাকে স্বপ্নে জমজম কূপ খননের আদেশ করা হয়। জমজমকে আরবিতে জমজম নামকরণে চমৎকার একটি বিশ্লেষণ রয়েছে। আরবিতে জমজম অর্থ বাঁধ দেওয়া। কূপের পানি ঠেকানোর জন্য মাটি দিয়ে বাঁধ দেওয়া হত, সেখান থেকে কূপটির নাম হয়ে যায় জমজম। আবদুল্লাহর বাবা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কূপ খনন করতে গেলে কুরাইশরা তাকে বাঁধা দেয়। দাদা আবদুল মুত্তালিবের হারেস নামে এক ছেলে ছাড়া আর কোনো ছেলে জন্ম নিচ্ছিল না, হারেসের নামেই লোকজন তাকে ডাকত। তখন তিনি মানত করলেন, এবার যদি তার দশটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয় তাহলে তাদের একজনকে কাবার বেদীতে রেখে আল্লাহ

---

[১] *বুখারি*: ৩৫৩২; *মুসলিম*: ২৩৪৫,২৩৫৫ ; *শুআবুল ইমান*: ২/১৪২; *আল মাওয়াহিব*: ২/২১

[২] *আল মাওয়াহিব*: ২/১৪; *আররিয়াজ*: ৪; *আশশিফা*: ২/৬২০

তাআলার নামে উৎসর্গ করবেন। অবশেষে তার দশ জন ছেলে জন্ম নিল। তিনি উৎসর্গের জন্য ছেলেদের নামে লটারি দিলেন, তাতে ছোট ছেলে আবদুল্লাহর নাম উঠল। তখন হিজাজের এক গণক পরামর্শ দিলেন, তুমি একটি উট আর আবদুল্লাহর মাঝে লটারি দাও। প্রথম দশবারে আবদুল্লাহর নাম আসল, এরপর আবার দশ বার দিলেন; তাও আবদুল্লাহর নাম আসল। এভাবে একশ বার হয়ে গেল; ঘুরেফিরে সেই আবদুল্লাহর নাম। সর্বশেষ তিন বার উটের নামে লটারি আসল। তখন আবদুল্লাহর বিপরীতে সেই উটগুলোকে জবাই করা হলো। তিনিই সর্বপ্রথম জানের বিপরীতে একশ উট প্রদানের রীতি চালু করেন। তবে কেউ কেউ বলেন, এই রীতির প্রবর্তক কলাম্মাস, কেউ বলেন আবু সায়্যারাহ।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ সবার ছোট ছিলেন, তবে এটা এক মায়ের সন্তানদের হিসেবে; অন্যথায় হামজা ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আবদুল্লাহর চেয়েও ছোট ছিলেন।

নবিজির চাচা ও ফুফু

হারিস, আবু তালিব, জুবায়ের, আবদুল কাবা, মুকাওয়িয়িম, (কেউ কেউ বলেছেন, শেষ দুটি নাম একজনেরই), জাহাল (তার মূল নাম ছিল আবুল মুগিরা), আলগাইদাক, কুসাম (অনেকে তার নাম অনুল্লেখ রেখেছেন), জিরার, আবু লাহাব; তার মূল নাম ছিল আবদুল উজ্জা, অতিসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে আবু লাহাব অর্থাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বাপ বলা হত। আখেরাতের বিবেচনায় তার এই লকবটি বেশ উপযুক্ত।[৩] এরা সবাই ছিলেন নবিজির চাচা।

সাফিয়্যা, আতিকা, উমাইমা, বাররা, উম্মু হাকিম বাইজা। সাফিয়্যা বাদে বাকিরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না—তা নিয়ে মতানৈক্য আছে।

জন্মের পূর্বকথা

উট জবাই শেষে ফেরার পথে আবদুল্লাহ পথিমধ্যে বনু আসাদের এক নারীর পাল্লায় পড়েন। তার নাম ছিল কুতাইলা, কেউ বলেন রুকাইকা বিনতু নওফেল, লকব ছিল উম্মু কিতাল, কেউ বলেন তার নাম ছিল ফাতেমা বিনতু মুর, কেউ বলেন, লাইলা আদাবিয়া, অথবা তাবালা, কিংবা খাসআম। কেউ কেউ বলেন, সেই নারী ছিল এক ইহুদি কন্যা। সে বলল, আবদুল্লাহ, তুমি যদি আমার সাথে সহবাস করো তাহলে যে পরিমাণ উট তোমার জন্য জবাই করা হয়েছে সে পরিমাণ উট আমি তোমাকে দেবো। মূলত আবদুল্লাহর দুচোখের মাঝে আলো ঝলকাত,

[৩] *সিরাতু ইবনু হিব্বান*: ৪৯-৫২ পৃষ্ঠা

দুই. আরবিতে 'কুরশ' মূলধাতুর আরও বেশ কয়েকটি অর্থ আছে; যেমন, যাচাই-বাছাই করা, একতাবদ্ধ হওয়া, ব্যাবসা করা, উস্কে দেওয়া; এই গুণগুলো থাকার কারণে তাদেরকে কুরাইশ নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেউ বলেন, পূর্বপুরষ কুসাইকে কুরাশি বলা হত, সেখান থেকে এই গোত্র কুরাইশ নামে পরিচিত হয়।

কেউ বলেন, সমুদ্রের একটি প্রাণীর নামে নামকরণ করা হয়েছে, যেটি অন্য প্রাণী ভক্ষণ করত।

নবিজির জন্ম

তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কার নাম অবশ্য অনেকগুলো। একটি হলো বাক্কা। আরবিতে বাক্কা অর্থ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া। মক্কা সকল প্রতাপশালী ও গ্যাঞ্জামকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। এজন্য তাকে বাক্কা বলা হয়। কেউ বলেন, মক্কা—শহরের নাম, আর বাক্কা—বাইতুল্লাহর নাম। মক্কার অন্যান্য নামগুলোর অন্যতম হচ্ছে, নাসা, র-স, সালাহ্, উম্মু রুহম, কুসা, উম্মুল কুরা, হাতিমা, আরশ ও তায়্যিবাহ।

জন্মের স্থান

একটি ঘরের মধ্যে; পরবর্তীতে যেটি হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফের ঘর হয়েছিল। কেউ বলেন শিআবে আবু তালিবে, কেউ বলেন রদম নামক স্থানে। কেউ বলেন উসফান নামক স্থানে।

দিনটি ছিল সোমবার, রবিউল আউয়ালের দুই তারিখ; কেউ বলেন আট তারিখ, কেউ বলেন দশ অথবা বারো। তবে ইবনুল জাজ্জার বারো তারিখের ব্যাপারে ঐকমত্যের দাবি করেছেন। তবে তার দাবিটি আপত্তির উর্ধ্বে নয়।[৭] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। হিজরতের জন্য মক্কা থেকে সোমবারে বের হয়েছেন। মদিনায় প্রবেশ করেছেন সোমবারে। মক্কা বিজয় করেছেন সোমবারে। সুরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়েছে সোমবারে। হাজরে আসওয়াদ উঠানো হয়েছে সোমবারে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়েছে সোমবারে। মাওলিদের তারিখ নিয়ে আরও কয়েকটি মত রয়েছে; সেগুলো হলো, রবিউল আউয়ালের সতেরো, আঠারো এবং বাইশ তারিখ। কেউ কেউ বলেছেন, যেদিন হস্তীবাহিনীর ওপর আবাবিল প্রেরণ করেন, সেদিন ভোরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেউ বলেন, হস্তীবাহিনীর হামলার বছর। ইবনুল জাজ্জার এ ব্যাপারে ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করলেও এখানে কথা থেকে যায়। হস্তীবাহিনীর ঘটনার একমাস পর, চল্লিশ দিন পর, দুই মাস ছয়দিন পর, পঞ্চাশ দিন পর, পঞ্চান্ন দিন পর, দশ বছর পর, ত্রিশ বছর পর, চল্লিশ বছর পর, সত্তর বছর পর, হস্তীবাহিনীর ঘটনার তেইশ বছর পর রমজানের বারো তারিখে,

[৭] *আত-তাবাকাত*: ১/১০০; *আল মুনতাজিম*: ১/২৪৫

আশুরার দিন, সফর মাসে, রবিউল আখিরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় বলে মত উল্লেখ করা হয়েছে।

হস্তীবাহিনী ও আবরাহার মণ্ডপ

কাবা ধ্বংস করতে আসা সেই হাতিটির নাম ছিল মাহমুদ।[৮] মূলত সেটি ছিল নাজাশির। হাতিটির সাথে আরও বারোটি হাতি যুক্ত হয়। যুদ্ধে সবগুলো হাতি নিহত হয় কেবল মাহমুদ বাদে। নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অগ্রবর্তীতার কারণে বেঁচে ফিরতে সক্ষম হয় সে। ঘটনার মূলে ছিল আবরাহা আশরাম। সে কুল্লাইস নামে একটি মণ্ডপ তৈরি করে, উদ্দেশ্য ছিল হজগামী মানুষকে তার মণ্ডপের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা। এর মধ্যে কিনানার এক লোক তার মণ্ডপে আসে এবং সেখানে অবস্থান নিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করে। এতে আবরাহা চরম ক্ষিপ্ত হয় এবং শপথ করে, আরবের সে ঘরে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেবে সে। শপথ পূরণের জন্য সে মহররমের পাঁচ অথবা তেরো তারিখ মক্কার পথে রওনা করে। কিন্তু হাতির বাহিনীকে কাবা আক্রমণে পাঠালে সে বাধাগ্রস্ত হয়। কোনোভাবেই বাইতুল্লাহ অভিমুখে সে এগোতে পারছিল না। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আংটার মতো নখবিশিষ্ট পাখি প্রেরণ করেন (পাখির আকৃতি বর্ণনায় আরও কিছু মত রয়েছে)। প্রতিটি পাখির সাথে তিনটি করে পাথর ছিল; একটি ঠোঁটে আর দুপায়ে দুটি করে। পাথরগুলোর আকৃতি ছিল ছোলা বা ডালের দানার মতো। পাথরগুলো যার গায়ে পড়ছিল তৎক্ষণাৎ সে মারা পড়ছিল। তবে সবার গায়ে সে পাথর পড়ছিল না।[৯]

জন্মের মুহূর্তের কিছু ঘটনা

সে রাতে কিসরার প্রসাদে ফাটল দেখা দেয় এবং চৌদ্দটি পিলার হেলে পড়ে। পারস্যে একহাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত আগুন নিভে যায়। সাওয়ার সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যায়।

গর্ভধারণ ও খাতনা

নবিজিকে গর্ভে ধারণ করার পর মা আমিনা কখনোই ভারত্ব অনুভব করতেন না। কোনো ব্যাথাও টের পেতেন না। তবে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মতোই জন্মগ্রহণ করেছি। তোমাদের মায়েরা যেমন গর্ভে ভারত্ব অনুভব করত আমার মাও তেমন

[৮] *সিরাতু ইবনি ইসহাক*: ১/৫২

[৯] *ইবনু ইসহাক*: ১/৫৩; *ইবনু সাদ*: ১/৯২; *জাদুল মাসির*: ৯/২৩৫

অনুভূতি নিয়ে আমাকে গর্ভধারণ করেছেন। বিপরীতমুখী এই দুটি বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বলা হয়, ভারত্ব অনুভব করতেন প্রথম রক্তপিণ্ড ধারণ করার সময়। পরবর্তীতে পূর্ণ আকৃতির পর আর ভারত্ব টের পেতেন না। এমনটি করা হয়েছিল তাঁর জন্মকে অন্যদের জন্মের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদান করতে। গর্ভকালীন সময় নিয়েও বেশকিছু মত উল্লেখ করা হয়। নয় মাস, দশ মাস, আট মাস, সাত মাস ও ছয় মাস—এই পাঁচটি মত পাওয়া যায়।[১০]

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতনা করা অবস্থায় জন্মলাভ করেন। জন্মের সময় চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল। হাত ছিল মুষ্টিবদ্ধ। তাসবিহ গোনার মতো শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করছিলেন। তবে খাতনার ব্যাপারে বলা হয়, সাত দিন বয়সে দাদা অথবা জিবরিল খাতনা করিয়েছেন।[১১]

সে-সময় খতমে নবুওয়ত প্রোথিত করে দেওয়া হয়। এটি ইবনু আয়েজের বক্তব্য।

নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ। নামটি মায়ের মুখ থেকে সর্বপ্রথম বের হয়। অনেকে বলেন, সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মুত্তালিব এই নামটি রাখেন।[১২]

নবিজির আগে যাদের নাম মুহাম্মাদ ছিল

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমনের পূর্বক্ষণে আরবে ছড়িয়ে পড়ে—নতুন নবির আগমনের সময় হয়ে গিয়েছে। তার নাম হবে মুহাম্মাদ। তখন থেকেই বহু লোক নিজ সন্তানের নাম মুহাম্মাদ রাখে; যাতে নিজের সন্তান নবি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, মুহাম্মাদ ইবনু সুফিয়ান ইবনু মুশাজি, মুহাম্মাদ ইবনু উহাইহা ইবনু জুলাজ, মুহাম্মাদ ইবনু হুমরান, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলাম আনসারি, মুহাম্মাদ ইবনু বারা বাকরি, মুহাম্মাদ ইবনু খুজায়ি সুলামি, মুহাম্মাদ ইবনু আদি ইবনু রবিআ ইবনু সাদ মিনকারি, মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনু রবিআ সাদি (তবে আমার ধারণা, এরা উভয়ে একজনই), মুহাম্মাদ উসাইদি, মুহাম্মাদ ফুকাইমি, মুহাম্মাদ ইবনু উসওয়ারা লাইসি, মুহাম্মাদ ইবনু হিরমান আমরি, মুহাম্মাদ ইবনু খাওলি হামদানি, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু রবিআ, মুহাম্মাদ ইবনু উসামা ইবনু মালিক।[১৩]

---

[১০] *সুবুলুল হুদা*: ১/৩৯৫; *আল মাওয়াহিব*: ১/১৪৬

[১১] *আসিরাহ লিজ-জাহাবি*: ২৭; *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*: ৮/২২৪

[১২] *ইবনু ইসহাক*: ১/১৫৭; *আদ-দালায়েল লিল বাইহাকি*: ১/১১৩

[১৩] *আল কাওলুল বাদি, সুবুলুল হুদা, তাবাকাতে ইবনু সাদ*: ১/১০৯

নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বের কিছু ঘটনা

মায়ের ইন্তেকাল

চার বছর বয়সে মা ইন্তেকাল করেন। অবশ্য বয়স নিয়ে আরও কয়েকটি মত রয়েছে—ছয়, সাত, নয়, পাঁচ ও বারো বছর এক মাস দশ দিন। ইন্তেকাল হয় আবওয়া নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেন, হাজুন এলাকার আবু দুব উপত্যকায়। মায়ের মৃত্যুর পর উম্মু আইমান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশ্রয় হলেন; তিনিই নবিজিকে কোলেপিঠে বড় করতে লাগলেন।

দাদার ওফাত

মায়ের মৃত্যুর পর দাদার আদরে বড় হচ্ছিলেন নবিজি। কিন্তু জীবন বসন্তের আট বছর পেরোতেই দাদা পরপারে পাড়ি জমান। দাদার মৃত্যুকালীন নবিজির বয়স নিয়েও কয়েকটি মত রয়েছে। যথাক্রমে—আট বছর এক মাস দশ দিন, নয় বছর, দশ বছর, ছয় বছর। কেউ কেউ বলেছেন তিন বছর। তবে এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। ওফাতের সময় দাদার বয়স ছিল একশ দশ বছর। এ ব্যাপারেও কয়েকটি মত আছে। যথাক্রমে—বিরাশি, একশ চল্লিশ, পঁচানব্বই।[১৭]

চাচার দায়িত্বে নবিজি

দাদার ওসিয়ত ও বাবা সহোদর হওয়ার সুবাদে নবিজির দেখভালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চাচা আবু তালিব। আবু তালিবের নাম ছিল আবদে মানাফ। কেউ বলেছেন, এটি ছিল তার উপনাম।[১৮]

সিরিয়া সফর

বারো বছর বয়সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচার সঙ্গে সিরিয়া সফরে যান। সে-সময় নবিজির বয়স কত ছিল সে ব্যাপারেও বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথাক্রমে—নয় বছর, বারো বছর এক মাস দশ দিন। কেউ কেউ

---

[১৭] *তাবাকাতে ইবনু সাদ*: ১/১১৯; *আল উয়ুন*: ১/১০৩

[১৮] *আল-ইসাবা*: ৭/২৩৫; *ইবনু সাদ*: ১/১২১; *ইবনু ইসহাক*: ১/১০৮

বললেন, আল্লাহ তাআলার বরকত নিয়ে তুমি ছুটে যাও। উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে রেখে বের হয়ে যান এবং সৈন্যদেরকে বাহনে চড়ার আদেশ দেন। উসামা যখন বাহনে উঠতে যাবেন সে-সময় উম্মু আইমানের দূত এসে খবর দিলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গিয়েছেন। তখন তিনি, উমর ও আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ফিরে আসলেন।

নবিজি যেদিন ইন্তেকাল করেন

রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ, প্রচণ্ড রোদ, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, এমন সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহিদ হয়ে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেন।

সুহাইলি বলেন, সোমবারে ইন্তেকাল হলে সেটি অবশ্যই মাসের দুই, তেরো, চৌদ্দ বা পনেরো তারিখ ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, সবাই এ ব্যাপারে একমত—নবিজির আরাফায় অবস্থান হয়েছিল জুমার দিন; সেটি ছিল জিলহজের নবম তারিখ, সে হিসেবে জিলহজ শুরু হয় বৃহস্পতিবার। তাহলে মহররমের শুরু হবে শুক্রবার অথবা শনিবার। যদি শুক্রবার হয় তাহলে সফরের শুরু হবে শনিবার অথবা রবিবার। সফর যদি শনিবার হয় তাহলে রবিউল আউয়ালের ১ তারিখ হয় রবিবার, না-হয় সোমবার। সুতরাং রবিউল আউয়ালের বারো তারিখে এটা হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

কালবি ও আবু মুখনিফ বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়েছিল রবিউল আউয়ালের দুই তারিখ।

তাবারি বলেন, এটি যদিও জমহুরের মতের বিপরীত, তবে বিগত তিন মাসের প্রত্যেকটিই যদি ২৯শে শেষ হয়, তাহলে এমনটি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে তাবারির এ কথাটি পরিপূর্ণ সঠিক নয়। কারণ, বাইহাকিতে এ মতের পক্ষে মালিক ইবনু আনাসের সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে মুতামির ইবনু সুলাইমান ও ওয়াকিদিও এমনটি বলেছেন।

খাওয়ারেজমি বলেন, নবিজির ইন্তেকাল হয় রবিউল আওয়ালের এক তারিখ।[২৫]

---

[২৫] তারিখুত *তাবারি*, ৩/২১৫/২০০; *তাবাকাত*, ২/২৭২; আররাওজুল উনফ, ৪/২৭০; সুহাইলি, ৪/২৭০; *দালায়িলুল বাইহাকি* : ৭/২৩৪

দাফনের সময়

বুধবার রাতে নবিজিকে দাফন করা হয়। কেউ বলেন মঙ্গলবার রাতে। কেউ বলেন, সোমবার দুপুরে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর। হাকিম এটি উল্লেখ করে সহিহ বলেছেন।[২৬]

অসুস্থতার সময়কাল

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারো দিন অসুস্থ ছিলেন। তবে কেউ বলেন চৌদ্দ দিন। কেউ বলেন তেরো দিন। কেউ বলেন দশ দিন।[২৭]

গোসল

নবিজিকে গোসল করান আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু; আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ছেলে ফজল তাঁকে সাহায্য করেন। কুসাম, উসামা ও শুকরান পানি ঢেলে দেন। আলি বাদে তাঁদের সবার দৃষ্টিশক্তির ওপর আবরণ পড়ে গিয়েছিল। কেননা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, কেবল তুমি আমাকে গোসল করাবে, আর কেউ আমার সতরের অধীন আসলে তার চোখের আলো নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে।[২৮]

গোসলের সময় আউস ইবনু খাওলিও তাদের সাথে উপস্থিত হন; তবে তাঁর কোনো কাজ ছিল না। কেউ কেউ বলেন, তিনি পানি বয়ে দিচ্ছিলেন। বলা হয়, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দরজায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন, নবিজির সম্মুখে যেতে আমি কেবল এ কারণে বাঁধাগ্রস্ত হয়েছি, তাঁকে আমি অনাবৃত দেখব—এটা তিনি পছন্দ করতেন না।[২৯]

নবিজিকে তার নিজ জামার ভেতরেই গরম কূপের পানি দিয়ে তিন বার গোসল করানো হয়। সে পানির সাথে বরই পাতা মেশানো হয়েছিল। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের হাতে একটি কাপড় পেঁচিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেটি নবিজির পরিহিত জামার নিচ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ডলে ডলে ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

---

[২৬] *সিরাতু ইবনি ইসহাক*: ২/৬৬৪; *ইমতাউল ইসমা*, ১/৫৫১

[২৭] *জাওয়ামিউস-সিরাহ*: ২৬৬; *আল-ওয়াফা*: ৭৯২

[২৮] *তাবাকাতে ইবনু সাদ*: ২/২৮৭; *কাশফুল বাজ্জার*: ১/৪০০

[২৯] *তাবাকাতে ইবনু সাদ*: ২/২৮৯

নবিজির জন্য বিশেষ বিধান

ক. ওয়াজিব

১. সালাতুদদুহা, ২. কুরবানি, ৩. বিতির, ৪. তাহাজ্জুদ, ৫. মিসওয়াক, ৬. পরামর্শ, ৭. শত্রুর মুখোমুখি অটল থাকা; চাই তারা সংখ্যায় বেশি হোক বা দুর্বল। ৮. ঋণ রেখে যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার ঋণ আদায় করা। ৯. স্ত্রীদের থাকা কিংবা না থাকার ইচ্ছাধিকার ঘোষণা করা। তবে কেউ কেউ বলেন, এটি মুস্তাহাব ছিল।

খ. নিষিদ্ধ বিষয়; এগুলো থেকে বেঁচে থাকলে অধিক নেকি বরাদ্দ রয়েছে

এগুলো দুই প্রকার; **এক.** সামগ্রিক বিষয়ে, **দুই.** বৈবাহিক বিষয়ে।

প্রথম প্রকার : ১. শের, লিখন। ২. জাকাত, তবে সদকার ক্ষেত্রে দুটি কওলই পাওয়া যায়। ৩. হেলান দিয়ে খাওয়া। ৪. পেয়াজ, রসুন ও মসলাজাতীয় খাবার। কেউ কেউ বলেন, নবিজির জন্য এটি মাকরুহ ছিল। ৫. যুদ্ধের পোশাক পরে ফেললে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আগে খুলে ফেলা; কেউ কেউ বলেন, এটা মাকরুহ ছিল। ৬. নফল নামাজ শুরু করলে তা তরক করা। ৭. মানুষকে দুনিয়ার যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। ৮. চোখের খেয়ানত করা; অর্থাৎ চোখ দিয়ে ইশারা করা।

দ্বিতীয় প্রকার : ১. কেউ তাঁর প্রতি অনাগ্রহী হলেও তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা। এটা ছিল নবিজির সম্মানার্থে। ২. আহলে কিতাব নারী ও মুসলিম বাঁদিকে বিবাহ করা। তবে এটা নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে ইখতেলাফ আছে।

গ. বৈধতার ভিত্তিতে যেসব বিধান একান্ত নবিজির জন্য ছিল

১. ধারাবাহিক রোজা রাখা। ২. গনিমতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বেই নিজের জন্য বরাদ্দকৃত অংশ আলাদা করে নেওয়া। ৩. ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ এবং সেখানে কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধ চালু রাখা। ৪. নিজের জানা অনুপাতে বিচার করা। ৫. নিজ ও নিজ সন্তানের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া, নিজ ও নিজ সন্তানের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর পক্ষে সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা। এ সুযোগগুলো কেবল নবিজির জন্য খাস ছিল। ৬. বিরান ও পতিত জমি নিজের জন্য বরাদ্দ দেওয়া। ৭. সটান শুয়ে পড়লেও অজু ভেঙে না যাওয়া। ৮. জানাবাত অবস্থায় মসজিদে অবস্থানের বৈধতা। ৯. স্ত্রীকে স্পর্শের মাধ্যমে অজু ভেঙে যাওয়া। ১০. কোনো মালিক থেকে কারও প্রয়োজনে খাবার-পানীয় নিয়ে নেওয়ার অনুমতি ছিল তাঁর জন্য। মালিকও এটা দিতে বাধ্য ছিল। নিজের জান দিয়ে নবিজির জান রক্ষা তার

জন্য জরুরি ছিল। ১১. নয় জন স্ত্রী রাখার বৈধতা। তবে সহিহ কথা হলো, এরচেয়ে বেশি রাখার অনুমতিও ছিল। ১২. হিবা তথা দানসূচক শব্দ দ্বারা বিবাহ সহিহ হওয়া। ১৩. তালাকের সীমাবদ্ধতা না থাকা। তবে সহিহ কথা, তাঁর তালাকও তিনটিতে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৪. দানসূচক শব্দ দ্বারা বিবাহ সহিহ হওয়ার পর সহবাস হোক বা না হোক কোনো সুরতেই নবিজির ওপর মোহর ওয়াজিব ছিল না। ১৫. বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী ও অভিভাবক বাধ্যতামূলক না থাকা। ১৬. ইহরাম অবস্থায় বিবাহ সহিহ হওয়া। ১৭. নবিজি কোনো স্বামীহীন নারীর প্রতি বিবাহে আগ্রহী হলে সেই নারীর জন্য নবিজির প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব ছিল। অন্য কারও জন্য সেই নারীকে প্রস্তাব দেওয়া হারাম ছিল। ১৮. স্ত্রী ও বাঁদিদের সাথে রাত্রিযাপনের বণ্টন জরুরী ছিল কি না—এ ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে।

ঘ. কেবল নবিজির জন্যই ছিল যে মর্যাদা

১. যেসকল স্ত্রীকে রেখে নবিজি ইন্তেকাল করেছেন সেসকল স্ত্রী অন্যদের জন্য হারাম ছিলেন। তবে যাদেরকে জীবদ্দশায় তালাক দিয়েছেন তাদের ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। তবে সহিহ কওল হলো, তারাও সকলের জন্য হারাম।

২. তাঁর স্ত্রীগণ হলেন উম্মতের মাতা—উম্মাহাতুল মুমিনিন। অন্য সকল মহিলাদের চেয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁদের সওয়াব-শাস্তিও অন্যদের দ্বিগুণ।

৩. তিনি সর্বশেষ নবি এবং আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজন।

৪. তাঁর উম্মত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মত। ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে তারা নিরাপদ।

৫. তাঁর সাহাবিরা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের লোক।

৬. তাঁর শরিয়ত চিরস্থায়ী, অন্যসকল শরিয়তকে রহিতকারী।

৭. তাঁকে দেওয়া কিতাব অলৌকিক; পরিবর্তন-পরিবর্ধনের আশঙ্কামুক্ত। নবিজির ওফাতের পর এটাই মানুষের জন্য দলিল হয়ে থাকবে। আর অন্য নবিদের সকল মুজেজা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

৮. তাঁর মাঝে গাম্ভীর্য ঢেলে দেওয়া হয়েছিল—যা একমাস দূরত্বের পথ হতেও অনুভব করা যেত।

৯. সমগ্র জমিন তার জন্য পবিত্র ও নামাজের উপযোগী করে দেওয়া হয়েছে।

১০. তাঁর ধর্মে কেবল গনিমত হালাল করা হয়েছে।

আব্বাসি খিলাফাহ

আবুল আব্বাস সাফফাহ

আব্বাসিদের প্রথম খলিফা হিসেবে বাইআতপ্রাপ্ত হলেন আবুল আব্বাস সাফফাহ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু আবদুল্লাহ আব্বাস। সময়টি ১৩২ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৩ তারিখ শুক্রবার।

আবদুল্লাহ ইবনু হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলির দুই ছেলে ইদরিস ও সুলাইমানের সন্তানরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

আন্দালুসে বিদ্রোহ করে আবদুর রহমান ইবনু মুআবিয়া ইবনু হিশাম ইবনু আবদুল মালিক।

১৩৬ হিজরির জিলহজ মাসের ১২ তারিখ রবিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। খেলাফতের ব্যাপ্তিকাল ছিল ৪ বছর ৮ মাস ১ দিন।

আবু জাফর মানসুর

তারপর খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেন তার ভাই আবু জাফর মানসুর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ। তিনি ২১ বছর ১১ মাস মুসলিম জাহান শাসন করেন। ১৫৮ হিজরিতে মাইমুন কূপের কাছে ইহরাম অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস, লেখক, বক্তা ও কুরআন-সুন্নাহর হাফেজ ছিলেন। প্রচুর ধন-সম্পদের কারণে তাঁকে আবুদ দাওয়ানিকও বলা হত। ইবনু হাজম বলেন, রাওয়ান্দিরা যখন তাকে ইলাহ বলে দাবি করতে শুরু করপ তখন তিনি নিজেই অস্ত্র হাতে বের হয়ে যান এবং তাদেরকে হত্যা করেন। তিনি বাগদাদ শহর নির্মাণ করেন এবং হারামের আঙিনায় অবৈধভাবে নির্মাণ হওয়া ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করেন। আবু মুসলিম খোরাসানিকে হত্যা করেন। আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে বিচারপতির দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে প্রহার করেন; তবে আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ একদম অস্বীকৃতি জানিয়ে দেন। বন্দি অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।